সিপিডি
সংলাপ সংক্ষেপ
২০২২ ৫

জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি: এখন এড়ানো যেত কি?

মূল বক্তব্য

> যেসমস্ত দেশের সাথে তুলনা করা হবে, সেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত এবং মাথাপিছু আয় বিবেচনা না করে জ্বালানী তেলের দাম তুলনা করা ঠিক নয়।
>
> — **ড. ফাহমিদা খাতুন**

> জনগণের কাছে একটা পরিষ্কার হিসাব আসা দরকার, বিপিসি'র কোনটা লাভ আর কোনটা লোকসান।
>
> — **ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম**

> জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে কৃষির উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। অথচ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতই হয়েছে সেচ কৃষি দিয়ে।
>
> — **জনাব আনোয়ার ফারুক**

> ডিজেলের দাম এত বেশি বাড়ানো হলো যে ডিজেল দিয়ে কারখানা চালু রাখা এক প্রকার অসম্ভব। ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার খরচ সবারই বেড়ে গেছে। শ্রমিকদের বেতন যদি বাড়ানো না হয়, তাহলে তারা এ খাত ছেড়ে চলে যাবে।
>
> — **জনাব ফজলে শামীম এহসান**

> সরকার রাজস্ব আয়ের মাধ্যম হিসেবে তেলের দামকে ব্যবহার করছে। এটি নীতিগতভাবে সঠিক কি না তা নিয়ে পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। তেল থেকে রাজস্ব আয়ের মনোভাব থাকলে হবে না।
>
> — **ড. ইজাজ হোসেন**

> সাধারণ মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য পুনর্বিবেচনা করা অত্যন্ত যৌক্তিক।
>
> — **জনাব মোজাম্মেল হক চৌধুরী**

প্রকাশকাল: ১৫ আগস্ট ২০২২

মিডিয়া ব্রিফিং ও আলোচনা সম্পর্কে

গত ৫ আগস্ট দেশে জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫২ শতাংশ বাড়ানো হয়। ডিজেল ও কেরোসিনের দাম প্রতি লিটারে ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে পেট্রোলের দাম ৮৬ থেকে ১৩০ টাকা এবং অকটেনের দাম বাড়ানো হয় ৮৯ থেকে ১৩৫ টাকা। জ্বালানি তেলের দাম এমন এক সময়ে বাড়ানো হলো, যখন দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের কষ্ট বেড়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামও নিম্নমুখী। জ্বালানি তেলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এড়ানো যেত কি না, সে বিষয়ে গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজস্ব কার্যালয়ে এক মিডিয়া ব্রিফিং ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি সিপিডি'র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা এবং বিষয়ের ওপর মূল প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. *ফাহমিদা খাতুন*। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব *আনোয়ার ফারুক*, বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ও জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. *ইজাজ হোসেন*, তৈরি পোশাকের নিটওয়্যার উপ-খাতের রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি *ফজলে শামীম এহসান*, যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব *মোজাম্মেল হক চৌধুরী* এবং সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. *খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম*।

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপনা

ড. *ফাহমিদা খাতুন* তার মূল উপস্থাপনায় বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্প্রতি জ্বালানি তেলের অবিস্মরণীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য বাড়ানো হয় ২৩ শতাংশ। এবার এমন এক সময়ে মূল্য বাড়ানো হলো, যখন অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নানাকারণে দেশের অর্থনীতি বিভিন্ন ধরণের চাপের মধ্যে আছে। দেশে এখন সরকারি হিসাবেই মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৭ শতাংশ। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। টিসিবির হিসাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো কোনো পণ্যের দাম গত এক বছরে ৪০ শতাংশ বেড়েছে। দেশে যখন আগে থেকেই নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য রয়েছে এবং কোভিডের প্রভাব এখনও পুরোপুরি যায়নি, তখন জ্বালানি তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি নানাভাবে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে। সরকার এই মুহূর্তে মূল্যবৃদ্ধি এড়াতে পারত। তার মতে, দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে সরকার যেসব যুক্তি দিচ্ছে, তা পুরোপুরি সঠিক নয়। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপস্থাপনের পাশাপাশি এর প্রভাব, দাম বৃদ্ধি কীভাবে এড়ানো যেত, সরকারের করণীয় এবং জ্বালানি নিয়ে সরকারের মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ কী হতে পারে— তার ওপর আলোকপাত করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *এ মিডিয়া ব্রিফিং-এর পরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ৫ টাকা কমিয়েছে যা ৩০ আগস্ট ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে।*

বিপিসি'র লোকসানের ব্যাখ্যা যথার্থ নয়

দাম বাড়ানোর কারণ ব্যাখ্যায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) লোকসান হচ্ছে এবং গত জুলাই পর্যন্ত লোকসান হয়েছে প্রায় ৮০১৫ কোটি টাকা। এর কারণ, জ্বালানি তেলে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, আর্ন্তজাতিক বাজারে দরবৃদ্ধির কারণে ভারতসহ আরও অনেক দেশে তেলের দাম বেড়েছে। এছাড়া দেশে জ্বালানি তেলের দাম কম থাকলে তা প্রতিবেশি দেশে পাচার হয়ে যেতে পারে।

ড. ফাহমিদা খাতুন এ প্রসঙ্গে বলেন, বিপিসি'র তো লোকসানের বিপরীতে লাভও হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী গত ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বিপিসি ধারাবাহিকভাবে মুনাফা করেছে, ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত যার পরিমাণ ছিল ৪৬,৮৫৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে জুলাই থেকে মে পর্যন্তও বিপিসি মুনাফা করেছে ১,০৬৪ কোটি টাকা। জ্বালানি তেল আমদানিতে সরকার অনেক কর আদায় করে থাকে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিসির কাছ থেকে এনবিআর-এর বিভিন্ন ধরনের ৯,২৫১ কোটি টাকা কর আদায়ের কথা। করের এ বোঝা ভোক্তারাই বহন করে থাকেন। বিপিসির মুনাফা থেকে সরকার টাকাও নিয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার বিপিসির কাছ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে দাম বৃদ্ধির পক্ষে আরেকটি যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, জ্বালানি তেলের দাম আর্ন্তজাতিক বাজারে অস্বাভাবিক বেড়েছে। এ কারণে দেশে সমন্বয় করা হলো। এ বিষয়ে *ফাহমিদা খাতুন* উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। গত ৮ আগস্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ৯৩ দশমিক ৯ ডলার।

আনোয়ার ফারুক বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে যখন দাম কমতির দিকে তখন দেশে বাড়ানো হলো। আমাদের দেশে একবার দাম বাড়লে সাধারণত পরে আর দাম কমে না। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যখন বিপিসি ৪৬ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করল, তখন তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক কম ছিল। তখন সরকার দাম কমায়নি। এ জায়গায় আরও বেশি কার্যকারিতা দরকার।

ড. ইজাজ হোসেন বলেন, সরকার এবার উল্লেখ করেনি, দেশে তেলের দাম বিশ্ববাজারে কত ডলার বিবেচনায় নিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে। যখন ডিজেলের দাম ৬৫ থেকে ৮০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়, তখন সরকারের ভাষ্য ছিল, ঐ দাম ব্যারেলপ্রতি ৮০ ডলারের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। কিন্তু যখন ১১৪ টাকা করা হলো, তখন কিছু বলা হলো না। সরকার যখন দেশের বাজারে দাম বাড়াল, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে ৯৫ ডলারে নেমেছে। তাহলে কি এর আগের বর্ধিত দরের সঙ্গে সমন্বয় করা হলো—তিনি প্রশ্ন তোলেন।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম উল্লেখ করেন, বিপিসির হিসাব অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। গত ছয় বছরে বিপিসির ৪৬ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে, যেখান থেকে সরকার নিয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। বলা হয়েছে, বাকি ৩৬ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৩৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব বলছে, বিপিসির ১১টি স্ব-অর্থায়ন প্রকল্প রয়েছে এবং সেখানে চলতি অর্থবছরে ব্যয় হবে ৩ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা। এর আগে এখানে ব্যয় হয়েছে ৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। ১১টি প্রকল্পের মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প এই মুহূর্তে সচল নয়। মাত্র পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। এর বাইরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অধীনে সরকারি অর্থায়নে একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সেখানে প্রায় ৫ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে। প্রশ্ন হলো, বিপিসির বাকি টাকা তাহলে কোথায় গেলো। সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিপিসি বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাহক। বিভিন্ন ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ২৫ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা জমা রয়েছে। প্রশ্ন হলো এই টাকা কোন টাকা। বিনিয়োগ হিসেবে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেখানে অল্প পরিমাণ টাকা ব্যবহার হচ্ছে। এর ভেতরে এক লাখ টাকা এবং ১০ লাখ টাকার বরাদ্দও রয়েছে। তাহলে বাকি টাকা কোথায় রয়েছে। বাকি টাকা আসলেই বিপিসি'র অ্যাকাউন্টে রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই পরিমাণ টাকা থাকার পরেও কেন সরকার বিপিসি'র লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধির ঘটনায় গেলেন। এটি মোটেই বোধগম্য নয়। জনগণের কাছে একটা পরিষ্কার হিসাব আসা দরকার, বিপিসি'র কোনটা লাভ আর কোনটা লোকসান। তার ভিত্তিতে বোঝা দরকার, ভোক্তার ওপর এই অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি যৌক্তিক কি না।

ড. মোয়াজ্জেম আরও বলেন, সরকার চলতি অর্থবছরে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১১ ডলার মূল্য ধরে তার পাবলিক অ্যাকাউন্টস হিসেব করেছে। সেই হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিপিসি'র বিনিয়োগ দাঁড়াবে ৫ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। অবাক করার বিষয় হলো, তাদের এ বিনিয়োগের টাকা কোথা থেকে আসবে। ১১১ ডলার ধরে জনগণের ওপর বাড়তি মূল্য আরোপ করে বিপিসি বিনিয়োগে যাবে কি না সে প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেন, প্রস্তাবিত বিনিয়োগের একটা বড় অংশ রয়েছে ইষ্টার্ন রিফাইনারির জন্য দুটো প্রকল্পে। এ দুটো অননুমোদিত প্রকল্প, কিছু প্রকল্প এখনও শুরুই হয়নি। কিছু প্রকল্পে অনেক বড় বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে ২০২৩ অর্থবছরে। মংলা অয়েল ইনস্টলেশন প্রকল্পের জন্য এর আগের বছর কোনো খরচই হয়নি। চলতি অর্থবছরে ২০৫ কোটি টাকা এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অথচ সরকার কিন্তু প্রকল্পের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলছে। প্রাধিকারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তা দেখা যাচ্ছে না।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা কতটুকু যৌক্তিক?

ড. ফাহমিদা খাতুন উল্লেখ করেন, সরকারের তরফ থেকে আরেকটি যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, আমাদের দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। বাস্তবতা হলো, অকটেনের দাম নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। আর নেপাল ও ভুটানে ডিজেলের দাম বেশি। ভিয়েতনাম আমাদের রপ্তানিতে অন্যতম প্রতিযোগী দেশ, সেখানে অকটেনের দাম লিটারে ১০৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৭ দশমিক ৯ টাকা। জার্মানি, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে দাম আমাদের চেয়ে বেশি। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা করা হচ্ছে, তা বিবেচনায় নিতে হবে। হংকংয়ের মাথাপিছু আয় আয় ৫৯,৬৬০ ডলার। জার্মানির ৫০,৮০১ ডলার এবং সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু আয় ৭২,৭৬০ ডলার। আর বাংলাদেশের মাত্র ২,৫০৩ ডলার। সুতরাং, যেসমস্ত দেশের সাথে তুলনা করা হবে, সেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত এবং মাথাপিছু আয় বিবেচনা না করে জ্বালানি তেলের দাম তুলনা করা ঠিক নয়।

এ বিষয়ে *ড. ইজাজ হোসেনের* মত হলো, উন্নত কিছু দেশে জ্বালানির উচ্চ মূল্য রয়েছে। তাদের আয়ের বিবেচনায় তেলের দাম, গাড়ির দাম-এগুলো নগণ্য। এসব দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে হবে না।

মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কী হবে?

ফাহমিদা খাতুনের মতে, তেলের মূল্য বাড়ানোর প্রভাবে তিনভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। লঞ্চ, বাসসহ পরিবহন ভাড়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। পণ্যবাহী ট্রাকের ভাড়া বেড়ে যাবে। বিভিন্ন খাতের উৎপাদনে প্রভাব ফেলবে। কৃষকদের ডিজেলচালিত পাম্পে খরচ বাড়বে। কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষুদ্র কৃষকদের কেউ কেউ খরচ পোষাতে না পেরে উৎপাদন কমিয়ে দেবে। কৃষি উৎপাদন কমে গেলে খাদ্যশস্য আমদানি বাড়বে। তখন আমদানি ব্যয় বেড়ে যাবে। যেকোনো ধরনের শিল্পের উৎপাদনে প্রভাব ফেলবে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের মুনাফা কমে যাবে। যেসব কারখানায় নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন খাতে প্রভাব পড়ার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে, যা জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত এর ভুক্তভোগী হবে সাধারণ মানুষ। দরিদ্র, নিম্ন আয় এবং নির্ধারিত আয়ের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, কোভিডের কারণে অনেকের আয় কমেছে। এছাড়া মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে। মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশ, আর ব্যাংকে আমানতের গড়ে সুদের হার ৬ শতাংশের মতো। সুতরাং আমানতের প্রকৃত সুদের হার ঋণাত্মক। এ পরিস্থিতিতে অনেকে সঞ্চয় ভেঙ্গে খাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ নানা ধাপে, নানা পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ অবস্থায় তাদের কিছুটা স্বস্তি না দিয়ে আরও মূল্যবৃদ্ধির চাপ দেওয়া হলে তারা কীভাবে বাঁচবে? হয়তো উচ্চবিত্তের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যারা দিন আনে দিন খায় কিংবা মাসিক বেতনের ওপর নির্ভরশীল, তারা কীভাবে পোষাবে, সে বিবেচনা করা হয়নি।

আনোয়ার ফারুক বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে কৃষির উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। অথচ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতই হয়েছে সেচ কৃষি দিয়ে। মোট ধানের ৬০ ভাগ বোরো থেকে আসে এবং তা শতভাগ সেচকৃত। ৪৫ থেকে ৫০ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায়, যার বেশিরভাগই বোরো। এর পাশাপাশি আলু, সবজি, গম ও অন্যান্য ফসলেও সেচ দিতে হয়। মূল সেচের প্রয়োজন হয় বোরো মৌসুমে। মোট ১৫ লাখ ৭৪ হাজার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার হয় সেচ কাজে। এর ৭০ ভাগ ডিজেল চালিত। এক বিঘা জমিতে সেচের খরচ ১৫০০ টাকা। ডিজেলের বাড়তি দামের জন্য সেচ খরচ ৫০০ টাকা বেড়ে যাবে। কিছুদিন আগে ইউরিয়া সারের দাম বাড়ানো হয়েছে। সেখানে ২০০ টাকা খরচ বাড়বে। পাওয়ারটিলার ও ট্রাক্টর শতভাগ ডিজেল চালিত। সেখানে বিঘাপ্রতি ৩০০ টাকা খরচ বাড়বে। বোরো চাষে বিঘাপ্রতি ন্যূনতম এক হাজার টাকা খরচ বাড়বে। আগামী বোরো মৌসুমে যদি ৪৭ বা ৪৮ লাখ হেক্টর জমি চাষ হয়, তাহলে ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষকের বাড়তি পুঁজি লাগবে। এ টাকা আসবে কোত্থেকে? দেশের ঋণ (credit system) ব্যবস্থায় কৃষক এক প্রকার ঢুকতেই পারে না। করোনার সময়ে ২০২০ সালে সরকার ৫ হাজার কোটি টাকার প্রনোদনা ঋণ দিয়েছিলো, তার ১০ শতাংশও কৃষক পায়নি।

তিনি মনে করেন, তারপরও কৃষক ধারদেনা করে চাষ করবে। কিন্তু বড় সমস্যা থেকে যাবে কৃষক তার পণ্য বিক্রি করার সময় যদি ন্যায্যমূল্য না পায়। বরাবরই দেখা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষককে কৃষিকাজে উৎসাহিত করে। কিন্তু ফসল তোলার পরে কৃষি মন্ত্রণালয় নীরব বসে থাকে এবং যদি প্রশ্ন করা হয় তারা কিনছে না কেন, তখন বলে যে প্রকিউরমেন্ট তো খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ। তার মতে, এক হাজার টাকা বিঘাপ্রতি খরচ বাড়লে প্রতি কেজি ধানে ২ টাকা করে খরচ বাড়বে। ধান যখন চাল হবে তখন কিন্তু উৎপাদন খরচ বেড়ে হয়ে যাবে ৫ টাকা। ফলে এখন যে মোটা চাল ৫২ টাকা তা আগামী মৌসুমে ৫৬, ৫৭ বা ৫৮ টাকা হয়ে যাবে। এমনকি ৬০ টাকাও হতে পারে। এতে নিম্ন-আয়ের মানুষ আরও চাপে পড়বে।

ড. ইজাজ হোসেন বলেন, সরকার এমন এক সময়ে তেলের দাম বাড়ালো, যখন মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। প্রধান খাদ্যপণ্য চালের দাম এখন অনেক বেশি। ফলে সরকারের এ সিদ্ধান্তের পেছনে অনেকে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। তার মতে, তেলের দাম ধনীর ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু গরিবের সবকিছুতেই প্রভাব ফেলে। ফলে তেলের দাম বাড়লেই একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়। পরিবহন ভাড়াসহ বাজারে সব কিছুর দাম বেড়ে যায়। সরকার কীভাবে এটা সহ্য করে?

ফজলে শামীম এহসান মনে করেন, শিল্প খাতে জ্বালানি তেলের প্রভাব দুই রকম। একটা প্রত্যক্ষ, অন্যটা পরোক্ষ। পোশাক কারখানায় গ্যাসের চাপ কম। গ্যাস দুই জায়গায় ব্যবহার হয়। একটা সরাসরি শিল্পে, আরেকটা ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য। কিন্তু পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তাদের ডিজেল ব্যবহার করতে হয়। ডিজেলের দাম আগে থেকেই বেশি ছিল। এখন মরার ওপর খাড়ার ঘা'র মতো ডিজেলের দাম এত বেশি বাড়ানো হলো যে ডিজেল দিয়ে কারখানা চালু রাখা এক প্রকার অসম্ভব। অন্যদিকে রপ্তানিতে গত দুই মাস ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে দরকষাকষির অবস্থা নেই। মন্দার প্রভাবে পোশাকের বিক্রি কমে গেছে। এই মুহূর্তে ক্রেতাদের (buyer) কাছ থেকে দর বাড়ানোর উপায় নেই। এখানে ব্যবসায়ীদের দু'টি বিকল্প রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে— জ্বালানি তেলের বাড়তি খরচের জন্য লোকসান বিবেচনায় অর্ডার কম নেওয়া। অন্যদিকে অর্ডার কম নেওয়াও দেশের জন্য ভালো নয়। কারণ ডলার সংকট চলছে। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। এ কারণে কারখানা চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে হবে। ফলে তারা খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছেন। বাড়তি যে খরচ হচ্ছে, তা ক্রেতাদের কাছ থেকে নিতে পারছেন না, আবার কারখানাও বন্ধ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আগের মুনাফার টাকা বা ভর্তুকি দিয়ে চালু রাখছেন সামনে ভালো দিন আসবে সে আশায়। এগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব।

পরোক্ষ প্রভাবের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার খরচ সবারই বেড়ে গেছে। শ্রমিকরা নিম্ন আয়ের মানুষ। আগের বেতনে তাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে যাবে। সেজন্য ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু ক্ষেত্রে বেতন সমন্বয় করতে হচ্ছে। যদি শ্রমিকদের বেতন যদি বাড়ানো না হয়, তাহলে তারা এ খাত ছেড়ে চলে যাবে। আগামীতে যা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী জানান, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর এর প্রভাব সরেজমিনে দেখার চেষ্টা করেছেন। বায়তুল মোকাররম মার্কেটের এক দোকানের কর্মচারীর তিন বছর আগে বেতন ছিল ৮ হাজার টাকা। সবেমাত্র তার বেতন ১০ হাজার টাকা হয়েছে। শনির আখড়ায় থাকেন। তার যাতায়াতে দৈনিক গাড়ি ভাড়া বেড়েছে ৭০ টাকা। মাসে তার খরচ বেড়েছে ২১০০ টাকা। তিনি এক রুমে সাবলেট করে এক বাচ্চা ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পরিবার গ্রামে পাঠিয়ে দেবেন। *মোজাম্মেল হক চৌধুরী* মনে করেন, মানুষ এ ধরনের চাপের মধ্যে থাকলে দুটি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। প্রথমত— কর্মজীবি মানুষের স্থানান্তর হলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত— কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের সংকট তৈরি হবে।

তিনি আরও জানান, শহরের মধ্যে প্রতিদিনের পরিবহন খরচ বেড়েছে ৭০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। প্রতি মাসে ২১০০ থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বাড়বে। এসব মানুষ সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩২ হাজার টাকা বেতনের কর্মচারী। দুই দিনে তার সাথে তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ মানুষের সাথে কথা হয়েছে। এসব লোকের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা গেছে। এসব লোককে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও তথ্য দেন, জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে, কিন্তু অটোরিক্সার ভাড়াও বেড়েছে। রাঙ্গামাটি, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন শহর থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। চালকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, অটোরিক্সা সিএনজিতে চলে, তারা কেন ভাড়া বাড়িয়েছেন। তারা বলেছেন, চালের দাম বেড়ে গেছে। বাজারে অন্যান্য পণ্যের দাম বেড়েছে। আগের আয়ে সংসার চলছে না। আগে সিএনজি চালকদের দৈনিক ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত আয় হত। এখন এই টাকায় সংসার চলছে না। সুতরাং তাকে ভাড়া বাড়াতে হয়েছে। একই কারণে প্যাডেলচালিত রিক্সার ভাড়াও বেড়েছে। সুতরাং সবক্ষেত্রে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে এই মূল্যবৃদ্ধি। তিনি জানান, দূরপাল্লার বাসে ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ভাড়া বেড়েছে। সরকার নগর পরিবহনে প্রতি কিলোমিটার ভাড়া বাড়িয়েছে ২ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু প্রতি কিলোমিটারে আদায় হচ্ছে ৩ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত। এসব বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই।

মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে এড়ানো যেত

আলোচকদের অনেকেই মনে করেন, সরকার এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এড়াতে পারত। এ বিষয়ে *ড. ফাহমিদা খাতুন* বলন, এটা ঠিক, অর্থনৈতিক নীতি পদক্ষেপ হিসেবে সাধারণভাবে ভর্তুকি সঠিক পদক্ষেপ নয়। কারণ, সরকার ধনী-দরিদ্র সকলকেই ভর্তুকি দেয়। ভর্তুকি আস্তে আস্তে তুলতে হবে, তা আইএমএফ-এর শর্তে হোক, বা শর্ত ছাড়া হোক। মূল্যবৃদ্ধির দরকার হলে ধাপে ধাপে করা যেত। জ্বালানি তেলের আমদানিতে কর কিছুদিন বন্ধ রাখা যেত। তার মতে, একদিকে সরকারের হাতে আর্থিক সংস্থান কমে গেছে, অন্যদিকে দুর্নীতি বন্ধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অভাবে অপচয় বন্ধ হচ্ছে না। এসব দিকে নজর দিতে পারত সরকার।

ড. ইজাজ হোসেন বলেন, তারা সরকারকে অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন, জ্বালানি তেলে ভর্তুকি তুলে দিয়ে একটা 'প্রাইসিং ফর্মুলা' করা উচিত। তার মানে এই নয় যে, হঠাৎ করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। তার প্রশ্ন, সরকার এত বেশি দাম বাড়ানোর সাহস করল কীভাবে! কারণ এর তো অনেক প্রভাব আছে! বলা হয়, দাম কম রাখলে ভারতে পাচার হয়ে যায়। ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ। সরকার কেন তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেনা তা বোধগম্য নয়। একটি অভিন্ন ফর্মুলা দু'দেশই অনুসরণ করতে পারে।

ড. ইজাজ হোসেন আরও বলেন, এখানে ভোক্তার অধিকার ঠিকমতো সংরক্ষণ করা হয় না। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নির্ধারণ করার কথা। কারণ এটি কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। কিছুদিন আগে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ কিন্তু সরকার করতে চায়নি। আদালত করতে বলেছে। তিনি মনে করেন, সরকার রাজস্ব আয়ের মাধ্যম হিসেবে তেলের দামকে ব্যবহার করছে। এটি নীতিগতভাবে সঠিক কি না তা নিয়ে পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। জ্বালানি তেল থেকে অনেক দেশই রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকারের পক্ষ থেকে তো বলা হত, ডিজেলে ভর্তুকি না রাখলে কৃষকের ক্ষতি হয়। এখন সে কথা বলছে না। হয়তো দেশ উন্নয়নের এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে, আর ভর্তুকি রাখতে চাইছে না। তবে বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এমন একটা চাপের সময়ে আছে, তখন অনেক দাম বাড়িয়ে জনগণের ওপর চাপটা দেওয়া হলো। এই দাম বাড়ানোতে সরকারের মুনাফা হচ্ছে। দেশ যখন সংকটে, তখন সরকার মুনাফা না করলেও পারত। তা না হলে কর প্রত্যাহার করতে পারত।

ফজলে শামীম বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোটা এড়ানো যেত কিনা, তা অনেক বড় ব্যাপার। কারণ সরকারের অনেক হিসাব-নিকাশ থাকে। তবে বাস ভাড়া পরদিন নির্ধারণ না করে, যেদিন তেলের দাম বাড়ানো হলো, সেইদিনই বাসের ভাড়া কতটুকু বাড়বে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। চাল পরিবহনে খরচ কতটুকু বাড়বে, গ্রাহক পর্যায়ে কত টাকা বাড়বে এসবের সঠিক তথ্য মানুষকে জানানো উচিত ছিলো। যদি সংবাদ কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যেত যে, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে চালের দাম কেজিতে ৮০ পয়সা বা ১ টাকা বাড়বে। তাহলে ব্যবসায়ীরা অবৈধ সুযোগ নিতে পারত না। ফলে তেলের দাম বৃদ্ধি এড়ানো না গেলেও ব্যবসায়ীদের এই সুযোগ নেওয়া এড়ানো যেত। সব মিলিয়ে তিনি মনে করেন, যদি এই মুহূর্তে তেলের দাম বাড়ানো এড়ানো যেত তাহলে ভালো হত। কিছুদিন সময় নিয়ে দাম সমন্বয় করলে ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তি পেত।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে বসবাসের সুযোগ দেওয়া। এটাই নাগরিকরা রাষ্ট্রের কাছে কামনা করে। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের কারণে নাগরিকরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে তখন অর্থনীতির ক্ষতি বড় হয়ে যায়। তিনি মনে করেন, একটি গবেষণা হওয়া দরকার যাতে জানা যায়, নাগরিকরা বিপর্যস্ত হয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে কত টাকা মুনাফার জন্য আমরা জাতিগতভাবে কত টাকার ক্ষতির শিকার হচ্ছি।

আনোয়ার ফারুক মনে করেন, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এড়ানো যেত। ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ দাম বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। সরকার যদি চাপে থাকে, যদি ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হয়, তাহলে ধাপে ধাপে করা যেতে পারে। কোভিডকালীন সংকট উত্তরণের পর্যায়ে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে এখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি যে জ্বালানি তেলের দাম এত বাড়াতে হবে।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, দাম বৃদ্ধি অবশ্যই এড়ানো যেত। বিপিসি যদি তার পূর্নাঙ্গ হিসাব ব্যবহার করত, তাহলে সে অর্থ দিয়েই বাড়তি ব্যয় সমন্বয় করার সক্ষমতা ছিল। ভর্তুকি অব্যবস্থাপনা মানে এই নয় যে, ভোক্তার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। অব্যবস্থাপনা, দুর্বলতা এবং অপচয়ের জন্য যে ব্যয় হচ্ছে, সেই ব্যয় থেকে বেরিয়ে আসাও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে। অন্যান্য জায়গায় যেসমস্ত অর্থ অব্যবহৃত রয়েছে, তা দিয়েও ভর্তুকি সমন্বয় করা যায়। সুতরাং আইএমএফ-এর জন্যও যদি এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেও ভোক্তার উপর চাপিয়ে না দিয়ে নিজস্ব তহবিল দিয়ে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারত। ভোক্তার ওপর দায় চাপানো ঠিক হয়নি। তার মতে, বিপিসি'র আয়-ব্যয়ের পূর্নাঙ্গ হিসাব, কোথায় কী বিনিয়োগ রয়েছে, কী উদ্দেশ্য রয়েছে এবং ভোক্তার ওপর এই মূল্যবৃদ্ধি আরোপের প্রয়োজন ছিল কিনা তা পরিষ্কারভাবে জনগণের কাছে জানানো দরকার। ভোক্তার ওপরে বাড়তি মূল্য চাপিয়ে না দিয়েও বিপিসি'র পক্ষে সম্ভব ছিল আরও বেশ কিছুদিন ব্যয় বহন করার; প্রতিষ্ঠানটির এ সক্ষমতা রয়েছে।

করণীয় কী?

আলোচকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। *ড. ফাহমিদা খাতুন* এ বিষয়ে বলেন, বিপিসিকে লোকসানে না রেখেও তেলের মূল্যে নিম্নমুখী সংশোধন করা যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে যেহেতু দর কমার প্রবণতা রয়েছে, তাই তেলের মূল্য শিগগিরই কমাতে হবে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি বাড়াতে হবে। টিসিবি'র তালিকায় আরও পণ্য যোগ করতে হবে। পাশাপাশি রেশন কার্ডের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আগে শুধু দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে পদক্ষেপ নেওয়া হতো। কিন্তু এখন তো এর বাইরে নিম্ন-আয়ের মানুষের পকেটও খালি হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকেও কম মূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। রেশনিং, খোলাবাজারে বিক্রি এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সহায়তা ঠিকমতো মানুষ পাচ্ছে কি না, যাদের পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছে কি না, বরাদ্দের পুরোটাই পাচ্ছে কি না— অর্থাৎ এসব কার্যক্রমে কোনো অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি হচ্ছে কি না, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যদিও পুরো প্রক্রিয়া তদারকি মধ্যমেয়াদের বিষয়, তবুও দুর্যোগের সময়ে, সংকটের সময়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা তাৎক্ষণিক যতটুকু সম্ভব তদারকি করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, ক্ষুদ্র ব্যবাসায়ীরাও সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাদের অনেকেই বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার কারণে কোভিডের সময় সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে সুযোগ নিতে পারেননি। শুধু এ ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্য সহজে প্রাপ্তির সুযোগ রেখে আরেকটি প্রণোদনা ঋণের প্যাকেজ করা যেতে পারে।

তার মতে, অনেক দেশে আর্ন্তজাতিক বাজারে মূল্যের ওঠানামার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করা হলেও আমাদের দেশে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা ভালো। তবে সরকারের মূল্য নির্ধারণের ফর্মুলা কী, তা জনগণের কাছে তুলে ধরা উচিত। উদ্যোক্তা, ভোক্তা এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করা হলে তা জনগণের জন্য কল্যাণকর হয়।

মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের করণীয় প্রসঙ্গে *ফাহমিদা খাতুন* বলেন, প্রাথমিক জ্বালানি উৎপাদনের পরিবর্তে আমাদের আমদানি নির্ভরতা বেশি। অনেক দামে এলএনজি কেনা হচ্ছে। অথচ গ্যাস উত্তোলনের সম্ভাবনা কাজে লাগানো হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, বাংলাদেশে তিনটি কুপ খনন করলে একটিতে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ধরনের বিনিয়োগ দেখা যাচ্ছে না। এখানে বিনিয়োগ করা জরুরি। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এর সম্ভাবনা অনেক। এর ফলে প্রাথমিক জ্বালানিতে বৈচিত্র্য আসবে এবং পরিবেশবান্ধব হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার পূরণেও তা সহায়তা করবে। এছাড়া তিনি যোগ করেন, বিপিসি'র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। সুশাসন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিপিসিকে গড়ে তুলতে হবে।

আনোয়ার ফারুক বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ বাড়ানোর সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কমপক্ষে ২০ শতাংশ চাল কেনা উচিত। তাহলে ফসল তোলার সময় কৃষকরা ভালো দাম পেতে পারে। ভারতে উৎপাদিত পণ্যের ২০ শতাংশ সংগ্রহ করে সরকার। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও ২০ শতাংশ সংগ্রহ করে সরকার। কৃষিমন্ত্রী বছরে ৫০ লাখ টন ধান কেনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন লাখ টন ধানও কেনা সম্ভব হচ্ছে না। বোরোতে ২ কোটি ১০ লাখ টন চাল হয়। সেখানে গত বছরও ৫ লাখ টন ধান সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নিয়ে ৩ লাখ টন সংগ্রহ করা হয়েছে। ২ কোটি ১০ লাখ টন চাল যেখানে উৎপাদন হয়, সেখানে ৫ লাখ টন ধান সংগ্রহ করলে তাতে কৃষকদের দামে প্রভাব পড়বে না। এ কারণে এপ্রিল-মে মাসে কৃষকরা সস্তায় ধান বিক্রি করে, পরবর্তীতে বেশি দামে চাল কিনে খায়। ফলে সরকারকে ক্রয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে জুনের ১৫ তারিখ যে সময়টা কৃষক ধান বিক্রি করে, সেই সময়ে একটা প্রিমিয়াম দামে সরকারকে ধান সংগ্রহ করতে হবে। বাজারে চালের দাম যা-ই থাকুন না কেন, ধান যদি সরকার প্রিমিয়াম দামে কেনে এবং উৎপাদিত ধানের ২০ শতাংশ সংগ্রহ করে, তাহলে এই মুহূর্তেই কৃষকরা ২০ থেকে ৩০ লাখ টন বেশি উৎপাদন করে দেবে।

তার মতে, এখন জ্বালানি তেলের চেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে আমন চাষ। কারণ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ৩০ শতাংশ জমিতে আমন বীজ রোপন করা সম্ভব হয়নি। আগামী সাত দিনের মধ্যে আমন চাষের 'সাপ্লিমেন্টারি ইরিগেশনের' জন্য বাজেট বরাদ্দ দরকার। নতুবা আমন মৌসুমে যে এক কোটি ৪৫ বা ৫৫ লাখ ধান উৎপাদন হয়, তাতে ব্যাঘাত ঘটবে। বোরোর সেচের জন্য সময় আছে। এ সংক্রান্ত নীতি পদক্ষেপ নির্ধারণে সরকারের সাথে দরকষাকষি করা দরকার। তবে এই মুহূর্তে আমনের সেচের একটা ঘোষণা সরকারকে দিতে হবে। না হলে আমন চাষ একটা বিপজ্জনক পর্যায়ে যাবে। তৃতীয়ত হচ্ছে কৃষককে চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে ক্রয়মূল্য আগাম বলতে হবে। তিনি মনে করেন, খাদ্য নিরাপত্তা যাতে বিপন্ন না হয় সেটি মাথায় রেখে সরকারকে এগোতে হবে।

তিনি সুপারিশ করেন, আমনে বা বোরোতে ডিজেলচালিত মেশিনগুলোতে ভর্তুকি মূল্যে তেল দিতে হবে। কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার সুযোগ নেই, থাকতেই হবে। সার অথবা ডিজেল সবক্ষেত্রে দিতে হবে। ১৫ লাখ মাত্র সেচ মেশিন আছে, যার ৭০ ভাগ ডিজেল চালিত, তাদেরকে দিতে হবে। দাম কতটা কমানো যাবে, তা আলোচনার বিষয়। তবে কোনোভাবেই আগের দামের চেয়ে বেশি হবে না। সম্ভব হলে তার চেয়ে কমাতে হবে। তা না হলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এবছরও দেখা গেছে সরকার চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ১০ লাখ টন চাল আমদানির এলসি খুলেও ৪ লাখ টনের বেশি আমদানি সম্ভব হয়নি। সংকটের সময়ে চাল সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর।

আনোয়ার ফারুক আরও বলেন, এখন যে পর্যায়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে খুব দ্রুত তা পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। দাম প্রতি সপ্তাহে সমন্বয় করা সম্ভব না হলে দুই সপ্তাহে একবার জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করতে হবে। কারণ সরকার ভর্তুকি তুলে নিচ্ছে, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারের দরেই জনগণকে দিক। তিনি মনে করেন, রেশন কার্ড প্রবর্তন না করাই ভালো। কারণ এ কাজে সবসময় অদক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে সরকার। কার্ড পায় দলীয় লোকজন। যাদের দরকার তারা পায় না। সেক্ষেত্রে খোলা বাজারে বিক্রি (ওএমএস) বাড়ানো যেতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে সরকারের ঘোষণা থাকা উচিত। ওএমএস এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বাড়িয়ে মানুষকে একটা সহনশীল পর্যায়ে আনতে হবে। এখন কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের নাভিঃশ্বাস অবস্থা। গার্মেন্টস খাতে ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে। তাদেরকেও তো কাজে রাখতে হবে। শ্রমিকরা যদি কাজ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে অর্থনীতিতে খারাপ প্রভাব পড়বে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষকে কষ্ট না দিয়ে সাশ্রয়ের জন্য প্রয়োজনে সরকারি অফিস তিন দিন খোলা থাকুক। এখন অনলাইনে অফিস করা যায়, করোনার সময়ে করেছে সবাই। তাহলে গাড়ি ও অফিসের জন্য ডিজেলের ব্যবহার কমে যাবে।

তিনিও মনে করেন, সরকার ভর্তুকি তুলতে চাইলে আমদানিতে কর প্রত্যাহার করে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু দর এমনভাবে নির্ধারণ করেন যাতে চোরাচালান করে না পোষায়। তবে দাম কোনো অবস্থাতেই কৃষকের ওপর চাপানো যাবে না।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী মনে করেন, সাধারণ মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য পুনর্বিবেচনা করা অত্যন্ত যৌক্তিক। সংকটকালীন সময়ে যাতে সাধারণ মানুষ এবং খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো সুযোগ তৈরি করে দেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সংকটকালে জ্বালানি তেল আগের মূল্যে ফেরত আসা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সংবাদ সংস্থা ইউএনবি'র প্রতিনিধি সদরুল হাসান জানতে চান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) মাধ্যমে গণশুনানির ভিত্তিতে বা একটা সুনির্দিষ্ট নীতির অধীনে এনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দাম নির্ধারণ করলে তার প্রভাব কী হতে পারে এবং তা দেশের জন্য কতটুকু উপযোগী? নাগরিক টেলিভিশনের প্রতিনিধি সাঈদ আরমান জানতে চান, মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে বেসরকারি খাতের কর্মীদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব সিপিডি করবে কি না? তিনি আরও জানতে চান, বিপিসি'র লিটার প্রতি খরচের হিসাব কি বাস্তবসম্মত? বিপিসি'র অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ হলে খরচ কমবে? রেলের ভাড়া বাড়ানো কি উচিত হবে? দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিনিধি মহিউদ্দিন বলেন, এ আলোচনায় অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দর উল্লেখ করে বিভিন্ন তুলনা করা হয়েছে। যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে কথা হচ্ছে। কিন্তু দেশে বেশিরভাগই পরিশোধিত তেল আনা হয়। যেহেতু ডিজেলের কথা উঠছে, সেহেতু পরিশোধিত ডিজেলের মূল্য দিলে ভালো হতো।

এসব প্রশ্নের উত্তরে *ড. ফাহমিদা খাতুন* বলেন, অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত তেলের দামে অবশ্যই পার্থক্য আছে। অপরিশোধিত তেলের দাম তারা বিভিন্ন তুলনার জন্য ব্যবহার করেছেন। সরকারি মহল থেকে বিভিন্ন দেশের দামের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। এর উপর পর্যালোচনা করতে যেয়ে তার উপস্থাপনায় এভাবে তুলনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, দামের পরে শিপমেন্ট খরচ থাকে, এলসি চার্জ, ইন্স্যুরেন্স, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট, ব্যাংক সেটেলমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন মার্জিন, ট্রান্সপোর্টেশন ইত্যাদি খরচ থাকে। সব মিলিয়ে যে খরচটা বলা হচ্ছে, তার চেয়ে তেলের দাম বেশি বাড়ানো হয়েছে বলে তাদের কাছে মনে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে বেসরকারি খাতে বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক ইজাজ হোসেন বলেন, অপরিশোধিত তেলের মূল্যের তথ্য সহজলভ্য। খুঁজলে পরিশোধিত তেলের মূল্য পাওয়া যায় না। তিনিও মনে করেন, সরকার যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তা খরচের চেয়ে বেশি। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারেরর ওঠানামার সাথে ভারত যদি মূল্য নির্ধারণ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের না পারার কারণ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, দুই রকম মার্কেট প্রাইস আছে। যেমন– ভারতে আর্ন্তজাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে একটা দর নির্ধারণ করে। অন্যদিকে আমেরিকায় একেক পেট্রোল পাম্পে একেক রকম দাম। ভারতে সরকারই দাম ঠিক করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ এমন করতে পারে। অবশ্য যদি কোনো কিছু করতে না চায়, তাহলে কোনো ফর্মুলাই গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যদিকে তেল থেকে রাজস্ব আয়ের মনোভাব থাকলে হবে না।

প্রশ্নের উত্তরে *মোজাম্মেল হক চৌধুরী* বলেন, রেলের ভাড়া এই মুহূর্তে বাড়ানো কোনোভাবেই উচিত হবে না। বিশেষ মূল্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে তেল সরবরাহ করছে সরকার। গণপরিবহনে যদি এ ধরনের সুযোগ থাকত তাহলে তারা আলাদা মূল্যে তেল সরবরাহের দাবি করতেন। রেল খাতকে বিশেষ মূল্যে তেল সরবরাহ করা যায় কিনা, তা নিয়ে বিপিসি'র সাথে আলাপ আলোচনা হতে পারে।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে *অধ্যাপক ইজাজ হোসেন* বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা এখনও তেলের ওপর নির্ভরশীল, যা হওয়ার কথা নয়। আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো তেলের ওপর চলছে। বিদ্যুতের দাম যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তাহলে পরিশেষে এর উৎপাদনে তেলের ব্যবহার কমাতে হবে।

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ড. ইজাজ হোসেন
সাবেক অধ্যাপক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট)
জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

জনাব ফজলে শামীম এহসান
সহ-সভাপতি
বিকেএমইএ

জনাব মোজাম্মেল হক চৌধুরী
মহাসচিব
যাত্রী কল্যাণ সমিতি

জনাব আনোয়ার ফারুক
সাবেক সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক
সিপিডি

বাস্তবায়নে

এই সংলাপ সংক্ষেপটি সিপিডি'র "বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা" প্রোগ্রামের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনুলিখনে: জাকির হোসেন
সহযোগী সম্পাদক: ফারাহ নুসরাত
সিরিজ সম্পাদনায়: ড. ফাহমিদা খাতুন

cpd.org.bd cpd.org.bd cpdbd CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০
ওয়েব: www.cpd.org.bd
ই-মেইল: info@cpd.org.bd